লোকসঙ্গীতের ধারায় উত্তরবঙ্গ

[redacted]

লোকসঙ্গীত হল লোকজীবনের গান। যার উৎস গ্রামের জল, মাটি, এবং হাওয়ায়। 'লোক' অর্থে আমরা বুঝি অধিকাংশ কৃষি ও কৃষি কেন্দ্রিয় জীবিকা নির্ভর সংহত জনগোষ্ঠী। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এর মধ্যে পরম্পরাগত শব্দ ও সুরের আভাষ চলে আসে। অনেক পরিবর্তনের ফলে নিজের আঞ্চলিক পরিবেশে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং পরবর্তীতে লোকসংগীত তার চিরন্তন প্রভাব নিয়ে মানুষের হৃদয়াঞ্চলের সীমানাকে অতিক্রম করে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। এর ভাষাও খুব সর্বজনীন স্তরে উন্নীত হয়। এই বৈচিত্রময় জগতে যদিও আজ রঙবেরঙের রকমারী গান মানুষের মস্তিষ্ককে হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু তবুও লোকসঙ্গীতের সহজ সরল রসাবেদন খুব সহজেই জনসাধারণের হৃদয়কে স্পর্শিত করে তুলে।

তবে এই লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি ঠিক কবে থেকে তার ঘনিষ্ঠ প্রমান পাওয়া যায় নি। গ্রহ, নক্ষত্রের মতোই আমাদের কাছে অজানা। এটুকু জানি আদিমযুগে মানুষের জীবন চর্চায় সুরই ছিল মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ভাষার ব্যবহার আসে অনেক পরে। মানুষ সহজাত অনুকরণ বৃত্তির ফলেই পশু, পাখী, নদীর চরকে অবলম্বন করেছে, ক্রমে আরও করেছে ধ্বনি বৈশিষ্ট্য। শব্দের উদ্ভবের ফলেই এভাবে সঙ্গীতের সূচনা হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ব্যাধি, খরা, বন্যার ফল থেকে রক্ষাপাওয়ার জন্য মানুষকে হতে হয়েছে সংগ্রামশীল, জাগ্রত হয়েছে গোষ্ঠী চেতনার বোঝাপড়া, কালের প্রভাবে মানুষ তাদের সৃজিত ভাষার মাধ্যমে মনোভাব ব্যক্ত করেছে। সময়ের পথ বেয়ে এসেছে সভ্যতার নব আলোক, অগ্রসর হয়েছে মানব সমাজ ও তাদের চিন্তা-ভাবনা। আর এভাবেই লোকায়ত জীবনের সঙ্গীত-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু আজ বিস্ময়ের বিষয় যে আজ আমরা রূঢ় বাস্তব থেকে উঠে ক্রমে সভ্যতার কদমত্ততায় হারিয়ে ফেলেছি- নিজেদের কৃষ্টি 'কালচার' ঐতিহ্যকে। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, খোকো, পিংপং আমাদের সময়কে এতটাই কেড়ে নিয়েছে যে কাবাডির খেলার 'বাঁধাবুলি' সহজ সরলভাক আওড়াতে গেলে জীব বেড়িয়ে আসে। মূলত সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে যদি বিরহ কে খুঁজে পাওয়া যায়, পুরানো কোনো স্মৃতিকে রোমন্থন করা যায়, তবে সে খোঁজ তো আমাদের চিরায়ত লোক সঙ্গীতের মধ্যেও খুঁজতে পারি। আজ অবসরের ফাঁকে বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে যারা সিনেমায় যায় তাদের কি লোক সঙ্গীতের কথা মনে পড়েনা। আর অরকেষ্টারের

Scanned with CamScanner

বিবর্ধিত সক ফুসফুসকে হাঁপিয়ে তোলে, তবুও সেখানে লাফালাফির দৃষ্টান্ত অনেক, কিন্তু তাদের কি ভাওয়াইয়া, অনুষ্ঠান ভালো লাগেনা। কোন বিরহীনি যদি কাতর হয়ে বিছানায় বালিশ ঠেকান দিয়ে আধুনিক 'পপ্-ডিস্ক-সক্' শুনে তার বিরহজ্বালাকে রোমন্থন করেন, তবে সেই ভাওয়াইয়া গান — 'প্রাণকোকিলারে, এত রাতে কেন রে ডাক দিলি....' তার মধ্যদিয়েও তো বিরহ জ্বালাকে খুঁজে পেতে পারেন। তাই গ্রামাঞ্চলে লোকসঙ্গীতের প্রভাব অতীতে ছিল, বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও যে থাকবে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিছু দৃষ্টান্ত —

নৌকাবাইচের গান :-

নদীমাতৃক দেশে যখন বর্ষাকালে এবং শরৎকালে নদী কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, সেই সময় এই মজার অনুষ্ঠান হয়। বাইচের অনুষ্ঠান চলার সময় মাঝিরা একসঙ্গে সমবেত হয়ে নৌকায় গান করতে করতে বিধা বেয়ে এগিয়ে চলে, এই গান 'নৌকাবাইচের গান' নামে পরিচিত। গানের কথা একটু হালকা ধরনের। কখনো ভক্তিমূলক আবার কখনো সমসাময়িক ঘটনাকে উল্লেখ করে উঠে আসে। গানের সুর ও তাল নিয়ন্ত্রিত হয় মাঝির মেজাজ অনুযায়ী। শেষে উত্তেজনা যখন চরমে পৌঁছায়, তখন গান-সুর-তাল সবই বিসর্জিত হয়, কেবল মাত্র কিছু শব্দ — 'হৈ', 'হিয়া', 'হেইয়ারে-হে' ইত্যাদি কলাহল থাকে। যেমন —

"(হেইয়াহো) সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও —
উজান চলে ধুইয়া
আগা পাছা নিশান ওরে
ন্যায় যুবতীর মন কাইর‍্যা রে.....।"

ভাটিয়ালী গান :-

এটি বাংলা লোকসঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য শাখা। এই গান মূলত পূর্ববাংলার গান, কিন্তু এখন সর্বত্রই স্থান দখল করে আছে। কথিত আছে যে 'ভাটি' শব্দকে কেন্দ্র করে ভাটিয়ালী গানের উৎপত্তি। চলমান স্রোতের উপরে নৌকার পালে বাতাস লাগিয়ে মাঝি-মোল্লারা যে গান গায়, সাধারণত তাই ভাটিয়ালী গান নামে পরিচিত। এই গান শুধু নদীর গান-ই নয়, সুরের অপ্রতিরোধ্য ঢেউ গিয়ে পৌঁছায় উন্মুক্ত প্রান্তরে চাষী এবং রাখালের কণ্ঠে। এই গানের বিষয় হয় দুটি প্রেম ও ঈশ্বর। মাঝি মোল্লাদের দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্নেহপ্রীতির প্রকাশ ঘটলেও কখনো কখনো আধ্যাত্মিক জীবনের কথাও ফুটে উঠে। যেমন —

"মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে,
আমি আর বাইতে পারলাম না...."

এতে ইহলোকিক জগতের সঙ্গে পারলৌকিক জগতের মেলবন্ধন দেখা

Scanned with CamScanner

যায়। কিংবা —

"ওরে সুজন নাইয়া
ক্যামনে যাবি ভবনদী বাইয়া.....।"

রাখালিয়া গান ঃ-

মহিষ চড়াতে চড়াতে কৃষকেরা যে গান গায়, তাকেই বলা হয়েছে মৈশাল গান। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে মহিষ অপেক্ষা গরু-ই প্রাধান্য পেয়েছে, তাই যেখানে গরু চড়াতে চড়াতে রাখালেরা যে গান গায়, তাকে বলা হয়েয়ে রাখালিয়া গান। রাখাল বন্ধুরা মাঠে মাঠে গরু চড়াতে এ সমস্ত গানের মধ্যদিয়ে তাদের হৃদয়াকুতির কথা ব্যক্ত করেন, যা নিত্যান্তই মমস্পর্শ। যেমন —

"আমি যে গরুর রাখাল, মাঠে মাঠে থাকি,
বাঁশরী বাজাইয়া পালের গরু বাছুর রাখি (রে)
কান্দে বাঁশী কার লাইগ্যারে ....।"

গানের সাথে সাথে প্রেম পাগলিনী মনোমুগ্ধকর 'মেঠোবাঁশীর' শব্দ প্রান্তর পেরিয়ে রাজপ্রাসাদের রমনীকুলের হৃদয়কেও নাড়া দিত।

ভাওয়াইয়া ঃ-

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার বিস্তৃত জনপদে রাজবংশী বা কামরূপীতে গীত যে সঙ্গীত ধারা তা ভাওইয়া বা ভাওয়াইয়া নামে পরিচিত। এ সঙ্গীতধারায় একক ভাবে রয়েছে প্রেমপ্রীতি, বাৎসল্য, মিলন, বিরহের গান। তবে ভাওয়াইয়া শব্দটি ঠিক কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ভাওয়াইয়া এসেছে 'ভাওয়া' শব্দ থেকে, কেউ বলেন 'বাও' থেকে, আবার অনেকে বলেন 'ভাও' থেকে। তবে বহুল প্রচলিত মতটি পাওয়া যায় ভাওয়াইয়ার একনিষ্ঠ সুর সাধক প্রায়ত 'সুরেন রায় বসুনিয়ার' মত থেকে। তিনি বলেছেন — 'ভাবপূর্ণ যে গীত মানুষকে ভাবাবিহ্বল করে দেয় তাই ভাওয়াইয়া।" ভাওয়াইয়ার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য কথার মাঝে বা শেষে অতিসূক্ষ্মভাবে 'হ' উচ্চারণের সমাবেশ। যেমন —

"অহ্‌কি ওহ্‌ বন্ধুমোহ্‌র কাহ্‌ জল ভোহ্‌মরা রেহ্‌,
কুহ্‌নদিন আসিবেহ্‌ন বন্ধু কয়ায়াহ্‌ যাওহ্‌ —
কায়ায়াহ্‌ যাওহ্‌রে.....।"

চটকা ঃ-

ভাওয়াইয়া গানের আরেকটি ধারা হল চট্‌কা গান। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এই গানের বিশেষ রসাবেদন আছে। অনুমান করা হয় - 'চুটকী' থেকে 'চটকা' কথাটি এসেছে। সমসাময়িক মনোমুগ্ধকর বিষয়নিয়ে এই

Scanned with CamScanner

গানগুলি তৈরী। সমাজের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরে জনগণের পানের উপযোগী করে তোলে —

"শুনোবন্ধু-বান্ধব-ভাই, এবার লেখা দেওয়া চাই।
'আয়ুধে এবার মনের কথা বুনে তুলব ভাই (২)
সভাপতি 'বিশ্ব' বাবুর অনেক শ্রমের ফল
সঞ্জয় দাদা, সুদীপ্তভাই যুগাইছে মনোবল
শত শত কাঁচা হাতের লেখা থাকবে ভাই
আয়ুধে এবার মনের কথা বুনে তুলা চাই।
শুন বন্ধু-বান্ধব-ভাই .....।"

চোরচুন্নী ঃ

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার অনেক স্থানে এই গানের বিশেষ সমাবেশ ঘটে। বহুল প্রচলিত লোকবিশ্বাস — আশ্বিন মাসের অমাবস্যার রাত্রে গৃহস্থের অজান্তে কোনো জিনিসে চুরি করে যদি কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে গৃহস্থের অজান্তে ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তবে সাড়াটা বছর এ চোর সফল ভাবে চুরি করতে পারবে। কিন্তু বৃত্তিধারী সেই বিশ্বাস এখন অন্যরূপ নিয়েছে। চোর যাতে এ দুই রাতেচুরি করতে না পারে, সেজন্য গৃহস্থের সারারাত জাগিয়ে রাখার জন্য পাড়ায় পাড়ায় যুবকেরা দলবদ্ধ ভাবে চোর-চুন্নী সাজিয়ে বাড়ী-বাড়ী গান গেয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে। বাস্তব জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনাবলীকে গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃষিজীবি তথা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত গানে তুলে ধরা হয়। যেমন —

"চুন্নী, সাড়ের দামতো আকাশ ছোঁয়া
পচিশ টাকা ত্যালের পোয়া
জমি বাড়ীত কাজ করিয়া পাইসা নাদে ঢোকো
ওকি ওহো মোর চুন্নী গে ....। ওরে
কালি হাতে কলেক যাই,
'শ' দিনের কাজোত নাম লেখাই....."

যেহেতু চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা রেখে গানগুলি রচিত হয়। তাই প্রত্যেক গানের শুরুটা চোর-চুন্নীর কণ্ঠ দিয়ে হয়। এতে রঙ্গ-রসিকরার কোন সীমা থাকে না —

"চুন্নী ওনেক শুনেক নয়া খবর
শুনেক মনোদিয়া
ভলোবাসার উঝাই নাগিলেক মোবাইল ফোন হয়া ...

Scanned with CamScanner

ওকি ওহো মোর চুমী গে ....."

গম্ভীরাগান :-

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে চৈত্র-সংক্রান্তি যে লোকায়ত বাংলার গাজন-চড়ক উৎসবই মালদা জেলায় গম্ভীরা নাম নিয়েছে। যদিও গম্ভীরা শব্দটি সম্পর্কে বহুমত প্রচলিত। পুরাণ কথা যাই থাক, বর্তমানে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সুখ-দুঃখের বানী-ই গম্ভীরা গানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিশেষত চাষীবাসী মানুষেরাই এই গানে সমবেত ভূমিকা নেন। উপসনায় 'শিব' থাকলেও, শিববিষয়ক কথা এখন গৌন হয়ে — মানুষের সুখ-দুঃখ ও অধ্যাত্ম ঘটনার কথাই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় —

১) "আরে ও দুটি খবর দিলো তুই মোক কি বাদে
দিবা নিশি প্রাণ কান্দে মোর
ঔ কালার বাদে।
আর সেইদিন হাতে গেইছে কালা,
শূন্য হইল মোর কদমতলা
কায় আয়ো বাজাবে বাঁশি রাধা বলিয়া....."

২) 'মনরে গুরু বিনে ভব নদী কায় করারে পার।
গুরু তুই মোর গোসাইয়া হে ... ওকি ওহে ....
পিতার মস্তকে ছিলাম
জননীর উদরে আইলাম
খেলা ভূমি স্থলে পড়িয়া
আমি এক স্বর।
গুরু তুই মোর গোসাইয়া হে .....।"

সঙ্গীত জগতে এ সমস্তগান এখন লোকশিক্ষা, মনশিক্ষা গান নামে বৃহৎ স্থান অধিকার করেছে।

পরিশেষে বলতে হয় যে, এই লোকসঙ্গীতের ধারাটা অনেকটা ঠিক প্রবহমান নদীর মতো। এই সঙ্গীতগুলি প্রথম অবস্থায় যেকোন বিষয়কে নিয়ে বা যেখানে থেকেই শুরু হোক না কেন, পরবর্তীতে আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। যুগ হতে যুগান্তরে ঘূর্ণীর ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের গন্ডীকে ভেদ করে জনগনের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। জয় করেছে সঙ্গীত দরদী মানুষের মনকে। পল্লীবাংলার যৌথজীবন ভাবনাকেন্দ্রিক এই গানগুলি, প্রকৃতির নদী, জল, বায়ু-র মতোই মানুষের অফুরন্ত সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিল্পী জগৎ থেকে তা উদারকণ্ঠে বিতরণ হচ্ছে, অপর দিকে শ্রোতাগণ তা উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করছে।

Scanned with CamScanner